জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০ (খসড়া)

ক. পটভূমি

বাংলাদেশ বিগত তিন দশকে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির টেকসই উন্নতি সাধন করেছে। জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এই সময়কালে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি ছিল। জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু ক্যালরি প্রাপ্তির নিরিখে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস এই ইঙ্গিত দেয় যে, সময়ের সাথে সাথে দেশে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ বেড়েছে। ২০০০-২০১৫ সময়কালে কৃষি শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় পৌঁছে দিতে সক্ষম করেছে এবং ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে। পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতা ও কৃশকায়তার হারের মতো অপুষ্টির সূচকে সময়ের সাথে সাথে উন্নতি হয়েছে। পুষ্টিহীনতার প্রবণতা বা 'ক্ষুধা' পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত সূচকের হার ১৯৯৯-২০০১ সময়ে গড়ে ২০.৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-২০১৮ সময়ে গড়ে ১৪.৭% এ উপনীত হয়েছে। একইভাবে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ২০০৪ সালের ৫১% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-২০১৮ সময়ে ৩১% এ দাঁড়িয়েছে। এগুলো সাম্প্রতিককালে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে দেশের প্রশংসনীয় অগ্রগতির পরিচয় বহন করে।

অতীতের এই আকর্ষণীয় সাফল্য সত্ত্বেও ১৬ কোটির বেশি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে বাংলাদেশ জটিল কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, উপরন্তু ২০৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ১৮ কোটি ছাড়িয়ে যাবার প্রাক্কলন রয়েছে। এছাড়াও নিকট ভবিষ্যতে আসন্ন কিছু নেতিবাচক প্রবণতা ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই কৃষির প্রসারে বর্তমানে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এমন আশঙ্কা আছে। এসব প্রবণতার মধ্যে রয়েছে অব্যাহতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদনশীলতায় শ্লথ গতি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, নগরায়ণ বৃদ্ধির ফলে নগরবাসীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বাজার শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। নগরায়ণের ফলে ভোগ এবং উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের পৃথকীকরণ ও দূরত্ব বৃদ্ধির কারণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মধ্যম ও উচ্চ-আয় শ্রেণিভুক্ত পরিবার, যারা তৈরি ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের পর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তাদের জন্য নিরাপদ খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। ক্রমবর্ধমান আয় এবং নগরায়ণের ফলে খাদ্যতালিকায় কিছু বৈচিত্র্য ঘটেছে, তবে তা অনেক ধীর গতিতে। উল্লেখ্য যে, খাদ্যশস্য এখনো মোট খাদ্যশক্তি গ্রহণের ৬০% এর বেশি দখল করে আছে। জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি সুষম খাবারের ঘাটতিতে রয়েছে; যেখানে ভিটামিন 'এ', ক্যালসিয়াম, জিংক এবং আয়রনের অভাব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'অপুষ্টির বোঝা' এড়াতে না পারলে স্থূলতা ও অসংক্রামক রোগের প্রবণতা বাড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এসব কারণ সঠিকভাবে মোকাবিলা করা না হলে বাংলাদেশ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে যে অগ্রগতি সাধন করেছে তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহের সাথে মিল রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবসান (এসডিজি-১), ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান (এসডিজি-২) অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়া, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন কর্ম-কাঠামো বাস্তবায়নসহ বৈশ্বিক পুষ্টি কার্যক্রম প্রসার আন্দোলন (SUN Movement) এবং জাতিসংঘের অ্যাকশন অন নিউট্রিশন দশকের (UN Decade of Action on Nutrition)

সদস্যপদ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। বহু খাত-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সম্পদ একত্রীকরণ ও সংহতকরণ এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ বেশ কিছু উদ্যোগ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন একটি টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে নীতি-পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড গ্রহণে সার্বিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিদ্যমান নীতি-কাঠামো সংশোধন ও হালনাগাদ করে একটি নতুন 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে সংগতি রেখে অতীতের খাদ্য নীতিসমূহে দেশে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের সাথে সাথে দেশে ধান-ভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলে এখন এমন কিছু নীতি ও নীতি-উপকরণ তৈরির সময় এসেছে যা বিভিন্ন পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহের জন্য উৎপাদন বৈচিত্র্যকে উৎসাহ দেবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত, পুষ্টিকর, বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুষম ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সার্বিক পুষ্টি অবস্থার ঈপ্সিত উন্নতি সাধন করবে। খাদ্যের জৈবিক সদ্ব্যবহার ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা (এসডিজি-৬), সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ (এসডিজি-৩) এবং খাদ্যের ক্ষতি ও অপচয় হ্রাসসহ (এসডিজি-১২) খাদ্য পরিবেশের সার্বিক উন্নতির প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, অতীতের খাদ্য ও পুষ্টি-সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহে দ্রুত ও কার্যকরভাবে কাঙ্ক্ষিত পুষ্টি অবস্থার উন্নতির জন্য পুষ্টি-কেন্দ্রিক এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল পদ্ধতি সুসংহতকরণের জন্য সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সমন্বয়কে গুরুত্ব দেওয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়নি। নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়ন এবং সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে পুষ্টি ফলাফলের উন্নতি অর্জনে খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থা উন্নয়নে নিয়োজিত বহু সংস্থা ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় আন্তঃসংযোগ কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তৈরি ও ফলাফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রগুলোকে এক ছাতার নিচে এনে সমন্বয়ের (এসডিজি-১৬) ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া অংশীদারীত্ব ও নীতি-সংগতি উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা (এসডিজি-১৭) সম্ভব হলে তা নতুন এই নীতিমালা বাস্তবায়নের সহায়ক হবে।

এই প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পথে এগিয়ে যেতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চূড়ান্ত বছরের সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নীতি বিশেষত অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক নির্দেশনা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সংজ্ঞা: 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা তখনই সম্ভব হয় যখন 'সকল সময়ে সকল জনগণের শারীরিক প্রয়োজন ও উপযোগিতা মেটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌত অবকাঠামোর সুফল প্রাপ্তির সুযোগ বজায় থাকে এবং সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ও সক্রিয় জীবন যাপনের অনুকূল নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য ও সেবা প্রদানে সহায়ক একটি সেবা-ব্যবস্থা ও পরিবেশ দ্বারা সমর্থিত হয়' (খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন -সিএফএস, ২০১২)।

খ. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

দর্শন: বাংলাদেশের সকল মানুষ সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করবে।

লক্ষ্য: জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির লক্ষ্য হল খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অবস্থার উন্নতি করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।

উদ্দেশ্যাবলী:

উদ্দেশ্য ১. স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

উদ্দেশ্য ২. সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য ও সুযোগ বৃদ্ধি;

উদ্দেশ্য ৩. উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি;

উদ্দেশ্য ৪. দুর্যোগ-প্রবণ ও দুর্গম অঞ্চলস্থ দুস্থ জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে জীবন চক্রব্যাপী পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধিকরণ; এবং

উদ্দেশ্য ৫. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তঃ-খাত কাঠামোর উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং অংশীজনের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

গ. নীতি প্রণয়নে অনুসৃত পদ্ধতি ও পরিপূরক নীতিসমূহের উপর নির্ভরশীলতা

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল, খাদ্য ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিবেচনা করা। অর্থাৎ এটি এমন একটি পদ্ধতি যা 'খাদ্য ব্যবস্থার সকল উপাদান (পরিবেশ, মানুষ, উপকরণ, প্রক্রিয়া, অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, বাজার ও বাণিজ্য) এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন, খাদ্য প্রস্তুতকরণ, খাদ্য গ্রহণ ও সদ্ব্যবহার এবং আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত সকল কর্মকাণ্ডের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করে (বৈশ্বিক খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স)'। উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচনে ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুষ্টিগত টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করতে সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য এই ধরনের একটি সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে বহু খাত-ভিত্তিক পদক্ষেপগুলো শনাক্ত করতে ও অগ্রাধিকার নির্ধারণকে সহজ করে। এই নীতির সামগ্রিক কাঠামো পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে চলমান দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনায় চিহ্নিত পাঁচটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বাজারমুখী। এখানে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন মূলত বেসরকারি খাতের ওপরে ন্যস্ত। এই বাস্তবতায় নতুন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং বেসরকারি খাতের সকল এজেন্ট যেমন: কৃষক, প্রক্রিয়াজাতকারী, বিপণনকারী এবং গ্রাহকদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য একদিকে প্রণোদনা দান এবং অন্যদিকে আইনি বাধ্যবাধকতা ও সুশাসনকে প্রধান উপকরণ হিসাবে দেখা হয়েছে। এছাড়া এই নীতিতে খাদ্য মূল্যের স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সরকারি খাদ্য সংগ্রহ, বিতরণ ও মজুত কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরোক্ষভাবে কৃষি অবকাঠামো ও পণ্যের উন্নয়ন এবং কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে নির্বাচিত ক্ষেত্রসমূহে সরকারি বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ সরকার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন খাতে বেশ কয়েকটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল। এই নতুন 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি'টি জাতীয় খাদ্য নীতি (২০০৬), জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (২০১৫), জাতীয় পুষ্টি নীতি (২০১৫), জাতীয় শিল্প নীতি (২০১৬) ও জাতীয় কৃষি নীতি (২০১৮)-এর মতো প্রাসঙ্গিক সকল খাতের প্রধান নীতিমালাসমূহের সাথে সুসংগতিপূর্ণ। একই সঙ্গে এই নীতি পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে পরিপূরক হিসেবে সরকার কর্তৃক গৃহীতব্য নীতি ও পদক্ষেপসমূহকে নির্দেশ করে। সংযুক্তি-ক'তে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির সম্পূরক ভূমিকা পালনে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক নীতিমালার তালিকা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নীতিগুলোতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির লক্ষ্য অর্জনে সম্পূরক সকল কৌশল ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ক্রিয়াকলাপ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। এটি স্বীকৃত যে, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির লক্ষ্য অর্জন বহুলাংশেই পরিপূরক নীতিমালাসমূহে চিহ্নিত আন্তঃ-খাতভিত্তিক সফল কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল থাকবে।

ঘ. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কৌশলভিত্তিক উদ্যোগসমূহের বিবরণ

উদ্দেশ্য ১: স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে খাদ্য লভ্যতা প্রধানত অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। তবে, নির্দিষ্ট কিছু খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাথাপিছু খাদ্য লভ্যতা বাড়াতে হলে অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হারে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা প্রায় ১.২৫% হারে প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। অতএব, ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বিদ্যমান জমিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অবশ্যই চলমান রাখা দরকার।

খাদ্য লভ্যতা বাড়ানোর দুটি উপায়: কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং টেকসইভাবে নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এলক্ষ্যে প্রধান প্রধান দানাদার ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি বৈচিত্র্যকরণের প্রয়োজনে আবাদি জমি ও নিয়োজিত শ্রম সম্পদের শ্রেয়তর ব্যবহার বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। উন্নত প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে অধিকতর পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল এবং প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাও গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তায় প্রাণি ও মৎস্য সম্পদের নানাবিধ ভূমিকা রয়েছে। এগুলো সহজপাচ্য আমিষ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং খাদ্যের মান ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। একইভাবে তা ক্ষুধা নিরসনে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এতদ্‌সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী নীতিমালাসমূহে প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও প্রাণি ও মৎস্য সম্পদের উপর গবেষণা ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত জোর দেওয়া হয়নি।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন ও লভ্যতা বৃদ্ধিসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করবে। এছাড়া অধিকতর বিনিয়োগের দ্বারা টেকসইভাবে কার্যকর সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলোর প্রসার ও প্রচার করার ব্যবস্থা করবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বিস্তার যেন কোনোভাবেই ভবিষ্যতে পরিবেশের অবক্ষয় এবং অস্থিতিশীলতার কারণ না হয় তা নিশ্চিত করার সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। এমনভাবে টেকসই নিবিড় কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটানো হবে যেন তা উৎপাদনশীলতা, লাভজনকতা (profitability) ও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

কৌশল ১.১ খাদ্যশস্য, শাক-সবজি ও ফলমূল, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্যসহ পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির একটি মূল কৌশল হল উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো প্রবর্তন, উন্নয়ন, প্রচার এবং প্রসার নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট বৈরী আবহাওয়ার কারণে জলবায়ু-অভিঘাত সহনশীল প্রযুক্তি (যেমন - খরা, বন্যা, অতিরিক্ত তাপ ও শীত এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত) গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত-সহনশীল ধান, গম ও ভুট্টার মতো প্রচলিত প্রধান খাদ্য ফসলের পাশাপাশি আমিষ সমৃদ্ধ ফসল (যেমন, ডাল ও শিম) এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল ও শাকসবজি উৎপাদনে অভিঘাত সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়া উচিত। একইভাবে প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত-সহনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন, প্রসার ও প্রচার করাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তির সমন্বয়ে জিনগত উন্নতি সাধনও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় হতে পারে। জিনগত উন্নতি সহযোগে বা এককভাবে ফসল, প্রাণি ও মৎস্য-সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বীজ, সার, কীটনাশক ও পানির মতো উপকরণগুলোর ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উত্তম কৃষি চর্চা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পরিবেশের পদচিহ্ন (environmental footprint) হ্রাস করতে পারে এমন উন্নততর খাদ্য ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র উৎপাদনকারীদের মুনাফা-ই বৃদ্ধি করে না বরং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অবদান রাখে।

উন্নত প্রযুক্তির গ্রহণ ও প্রসার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সম্প্রসারিত সরবরাহ ব্যবস্থা সংস্কারের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রচলিত সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় গবেষণা-প্রসূত প্রযুক্তির নির্বাচিত প্যাকেজগুলো একটি অনুভূমিক ও স্তর-ভিত্তিক (horizontal and vertical) স্থানান্তর পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। বহুমুখী বাণিজ্যিক কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার ঘটাতে অপেক্ষাকৃত কম উপযুক্ত সম্প্রসারণ পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করার জন্য যথাসময়ে যথোপযুক্ত সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮-এর নির্দেশনা অনুসারে সম্প্রসারণ ব্যবস্থা উন্নতির মূল কৌশল: উৎপাদকদের যথাসময়ে পরামর্শ দান নিশ্চিত করতে সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কৃষক দল বা সমিতির সদস্য বা সমবায়ীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান এবং বিশেষত দুর্যোগ-প্রবণ অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমে স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বহুমুখীকরণ, টেকসইভাবে কৃষি নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ এবং পুষ্টি কার্যক্রমসমূহের প্রসারকল্পে উন্নত ও জলবায়ু-উপযোগী প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও অভিযোজন;

২. কার্যকর এবং অংশগ্রহণমূলক সম্প্রসারণ পরিষেবাগুলোর মাধ্যমে কৃষক ও খামারি পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তির প্রসার;

৩. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের সময়মত ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি;

৪. টেকসইভাবে উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে কৃষি উপকরণ (বীজ, চারা, জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, পানি, সার, কীটনাশক এবং প্রাণি ও মৎস্য খাদ্য) ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে-

(ক) সমন্বিত শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নত পদ্ধতি সম্প্রসারণ;

(খ) রাসায়নিক সারের সুষম প্রয়োগ এবং জৈব-সারের ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উত্তম কৃষি চর্চায় সমর্থন নিশ্চিতকরণ;

(গ) বীজ, কৃষি-রাসায়নিক ও সারের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রবিধান প্রণয়ন এবং সেগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) আমন ও আউশ মৌসুমে সম্পূরক সেচের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি এবং বোরো মৌসুমে সেচের খরচ হ্রাসকল্পে পানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশ সম্মত বিকল্প সেচ-প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারে প্রসার ও প্রচার;

(ঙ) জমি প্রস্তুতকরণ থেকে ফসল আহরণের সকল পর্যায়ে কৃষি কার্যক্রমের যান্ত্রিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি;

(চ) বায়োসাইডস বা জীবননাশকের (বালাই ও কীট নাশক, ফাঙ্গিসাইডস, হার্বিসাইডস ইত্যাদি) পরিমিত প্রয়োগ নিশ্চিত করাসহ মানব-স্বাস্থ্য, প্রাণিজগৎ ও পরিবেশের উপর সেগুলোর বিরূপ প্রভাব হ্রাসকরণ;

(ছ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ওয়ান-হেলথ নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করে প্রাণিসম্পদের জন্য প্রতিবেশবান্ধব ও দায়িত্বশীল অনুশীলন পদ্ধতি প্রচলন, উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ;

(জ) পরজীবী ও সংক্রামক রোগের নিয়ন্ত্রণকল্পে, বিশেষ করে বৃহত্তর পরিসরে পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণি-পালনের জন্য সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণির স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(ঝ) অ্যান্টিবায়োটিকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নিরাপদতার মান বজায় রেখে মানসম্পন্ন প্রাণিজ খাদ্যপণ্য উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ;

৫. মৎস্য ও প্রাণি খাদ্য শিল্পের প্রসারে অধিকতর সমর্থন নিশ্চিতকরণ;

৬. সামুদ্রিক মৎস্য ও জলজ চাষ কৌশল ও ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সুনীল সম্পদ প্রবৃদ্ধি উন্নতকরণে পরিবেশ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন;

৭. সকলের ক্ষেত্রে বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত খাদ্যের বর্ধিত মূল্য প্রাপ্তিতে উৎপাদনকারী, উৎপাদক দল ও সমবায়ের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ।

কৌশল ১.২ পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ

পুষ্টি সমৃদ্ধ অদানাদার শস্য, মৎস্য ও প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে পুষ্টি-সংবেদনশীল উৎপাদন পদ্ধতির বহুমুখীকরণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রসার ও প্রচারসহ গবেষণা বা উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এছাড়া খাদ্য উৎপাদনের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিনিয়োগ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সহায়তা প্রদানে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে। এলক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে পুষ্টিকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধি করতে বহুমুখী উৎপাদন কার্যক্রমে বসতবাড়িতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. সবজি, মৎস্য, প্রাণি ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যসহ অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্যসামগ্রীর পারিবারিক পর্যায়ে উৎপাদন ও খাদ্য ভোগ (স্থানীয়ভাবে প্রচলিত ও পছন্দনীয় খাদ্যসহ অব্যবহৃত বা অপ্রচলিত উৎসের খাদ্য) বহুমুখীকরণে প্রসার ও প্রচার;
২. চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদের সুবিধার মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনে বাজার-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকল্পে ফসল, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের সংগ্রহ, মজুত, পরিবহন ও বিপণনে ক্ষয়ক্ষতি (পরিমাণ ও গুণগত) হ্রাস ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. ফসল, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের উৎপাদন ও বিপণন ঝুঁকি হ্রাসকরণে উপযুক্ত বীমা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
৪. অদানাদার শস্য, মৎস্য ও প্রাণিজ খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সংগঠিত বিপণন সুবিধাসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কৌশলের বিকাশ, প্রসার ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. পুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্য (যেমন- ডাল, বাদাম, তৈলবীজ, উদ্যান শস্য, মসলা এবং প্রাণিজ উৎসের খাদ্য) উৎপাদনের জন্য উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেগুলোর প্রসার ও প্রচারে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি হ্রাসে উদ্যোগ গ্রহণ;
৬. পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য বহুমুখীকরণ অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও এককেন্দ্রিক (coordination and convergence) করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

উদ্দেশ্য ২: সাশ্রয়ী-মূল্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য ও সুযোগ বৃদ্ধি

খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য বা অভিগম্যতা (access to food) হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিগম্যতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে: একটি ভৌত অভিগম্যতা এবং অন্যটি অর্থনৈতিক অভিগম্যতা। একটি পরিবারের ভৌত অভিগম্যতা বিপণন অবকাঠামো, যেমন -বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার রাস্তার মান ও দূরত্ব, গুদাম অবকাঠামো এবং সার্বিক বাজার শৃঙ্খলের উপর নির্ভর করে। তবে, দূরবর্তী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারে খাদ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতার উপরেও ভৌত অভিগম্যতা নির্ভরশীল। অপরদিকে, খাদ্যে অর্থনৈতিক অভিগম্যতা পরিবারের খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য অর্থাৎ খাদ্যমূল্য, পারিবারিক আয় ও সম্পদ-ভিত্তি বা সম্পদ-সংস্থানের উপর নির্ভর করে। নিঃসন্দেহে, পরিবারের বাড়তি আয় তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটি প্রধান নির্ধারক হিসেবে পরিগণিত। কারণ স্থানীয় বাজারে খাদ্য পাওয়া গেলেও দরিদ্রদের খাদ্যে অভিগম্যতার জন্য পর্যাপ্ত ক্রয় ক্ষমতার অভাব বিদ্যমান। তদুপরি, অভিঘাত আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি হওয়ার কারণে দরিদ্রদের খাদ্যে অভিগম্যতা হ্রাস পায়। খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে স্বভাবতই ভোক্তাদের প্রকৃত আয় হ্রাসের মাধ্যমে খাদ্যকে কম অভিগম্য করে তোলে। সুতরাং, খাদ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, বিশেষত স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য, খাদ্যের অভিগম্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এছাড়া বর্ধিত সম্পদ-ভিত্তি আয় প্রবাহে স্বল্প-মেয়াদি বাধাসমূহের ঝুঁকি হ্রাস করে। কারণ সম্পদের একটি অংশ বিক্রি করে ক্ষণস্থায়ী আয়ের ঘাটতি কিছুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

খাদ্যপণ্যের মান ও মূল্য শৃঙ্খল দুটি ভিন্ন উপায়ে স্বাস্থ্যসম্মত এবং পুষ্টিকর খাদ্যে অভিগম্যতাকে প্রভাবিত করে। একটি পণ্য প্রাথমিক উৎপাদক থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে সরবরাহ ও মূল্য শৃঙ্খলে অর্থনৈতিক মান যুক্ত হয়। এই

মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়াটি উৎপাদনকারীসহ মূল্য শৃঙ্খলে নিয়োজিত সকলের আয় বৃদ্ধি করে। ক্ষুদ্র পরিসরের উৎপাদনকারীদের সাথে বাজার এবং সুপারমার্কেটসমূহের সংযোগ স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়-বর্ধক কৌশল হিসেবে খাদ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। খাদ্যপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নয়নসহ নিয়োজিত সকলের আয়ের উপর প্রভাব ফেলার পাশাপাশি খাদ্যের গুণগতমান, নিরাপদতা এবং পুষ্টিমান রক্ষায় একটি উন্নত ও দক্ষ খাদ্য মূল্য-শৃঙ্খল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

কৌশল ২.১ বাজার অভিগম্যতা উন্নতকরণ এবং খাদ্য বাজার স্থিতিশীলকরণ

একটি কার্যকর খাদ্য বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাজার কাঠামোকে চাহিদা, উৎপাদনের ধরন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং বিশ্ব বাণিজ্য পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। বাজারের উন্নত পরিবেশের জন্য দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা, মধ্যস্থতাকারী অবকাঠামো, উন্নত খাদ্য সংগ্রহ ও মজুত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা দরকার। পাশাপাশি বাজার উন্নয়নসহ প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায় সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বৈষম্যহীন আর্থিক পরিষেবা, নিরাপদতার মান উন্নয়ন ও প্রয়োগ, কার্যকর বাণিজ্য-সহায়ক আইনি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ভারসাম্যপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার সহায়ক হতে পারে এরূপ বাছাইকৃত সরকারি খাদ্য কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। তার মাধ্যমে খাদ্য মূল্য স্থিতিশীল করার পাশাপাশি একটি কার্যকর খাদ্য বাজার বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকে অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি খাতকে অবদান রাখতে সহায়তা করার জন্য বিপণন অবকাঠামো ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক তথ্যব্যবস্থা এবং ব্যবসা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ জরুরি। খাদ্যপণ্য বিপণনের সুবিধাগুলো যেমন- উপযুক্ত বিক্রয় স্থান, নিলাম ঘর, ওজন সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিক বিলিং সিস্টেম বাজারের কার্যকারিতা উন্নত করতে সহায়ক। এ কারণে, বাজার অবকাঠামোসমূহের সুবিধাদি (যেমন- মৎস্য ও পোল্ট্রির জন্য স্থানান্তর, পরিবহন ও সংরক্ষণ সুবিধা সম্পন্ন বিপণন ও বাণিজ্য কেন্দ্র, আধুনিক কসাইখানাসহ মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও সংরক্ষণাগার স্থাপন এবং সব ধরনের পচনশীল খাদ্যপণ্যের জন্য বিশেষায়িত কোল্ড চেইন, সংরক্ষণ সুবিধা ও পরিবহন ব্যবস্থা) আরও সম্প্রসারণ করা দরকার।

সকলের জন্য খাদ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীলকরণের পাশাপাশি অরক্ষিত, দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী ও আদিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম পরিচালনা করতে সরকারিভাবে মজুতকৃত খাদ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে, সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় সরকারি মজুত সংরক্ষণের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ, পরিবহন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে অধিকতর জোর দেওয়া দরকার। ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সহায়তা প্রদানের জন্য চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে সরকারি খাদ্যশস্য মজুতের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ এবং মজুতকৃত খাদ্যশস্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (উদ্দেশ্য ৪ এর সাথে সংযুক্ত)। সরকারি খাদ্য মজুত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য বাজারের স্বাভাবিক কার্যকারিতার উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে সহায়ক রূপরেখা তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। নির্বাচিত ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিপণনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফি, শুল্ক এবং খাজনা যা বর্তমানে বিপণন ব্যবস্থায় ধার্য করা হচ্ছে সেগুলো আরও যৌক্তিক করা দরকার। বিপণন এজেন্ট, পাইকার, অনানুষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং বিপণনে অর্থলগ্নিকারীদের মতো মধ্যস্থতাকারীদের ইতিবাচক ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। বিপণন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে নতুন উদ্যোক্তা এনে বাজারের কাঠামো উন্নয়নে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে নিয়ন্ত্রক ও আইনি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

খাদ্য বাজারের অভিগম্যতা উন্নত করতে এবং খাদ্য বাজারকে স্থিতিশীল করতে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত (যেমন-গুদামজাতকরণ, সাইলো ও বিশেষায়িত হিমাগার, পরিশুষ্ক, মাড়াই ও পেষণযন্ত্র, সতেজ খাবারের স্থানীয় বাজার) সুবিধা উন্নয়নের পাশাপাশি মধ্যস্থতামূলক পরিষেবা (যেমন-আর্থিক সেবা ও বীমা সুবিধা, নিয়ন্ত্রক সংস্থার উপস্থিতি, সম্পত্তির স্বত্বাধিকার) এবং বিপণন

পরিকাঠামো সুবিধাদি (যেমন- ক্ষুদ্র কৃষক ও খুচরা ক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ, গ্রোথ-সেন্টার, সুপারমার্কেট চেইন, গ্রামীণ বাজার এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিপণি কেন্দ্র) উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

২. সরকারি খাদ্যশস্য মজুতের জন্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি (আপৎকালীন মজুত, সামাজিক নিরাপত্তা মজুত ও মূল্য স্থিতিশীলকরণে ব্যবহার্য মজুতের সমন্বয়ে কাঙ্ক্ষিত সরকারি মজুতের পরিমাণ ও স্থান নির্ধারণসহ);

৩. বাজার প্রতিনিধি ও জনসাধারণের জন্য সরকারি খাদ্য মজুত ও বিতরণ পরিকল্পনার নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রচার কৌশল প্রবর্তন;

৪. বাজার ব্যর্থতার কারণসমূহ (প্রতিযোগিতা-প্রতিকূল কার্যক্রম, সরবরাহে বাঁধা বা একচেটিয়া ব্যবসা ইত্যাদি) দূরীভূত করে সুশৃঙ্খল বাজার পরিচালন ব্যবস্থা বজায় রাখার পাশাপাশি মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি রোধকরণ;

৫. খাদ্যশস্য বিতরণের পাশাপাশি ডাল, বাদাম ও ভোজ্যতেলের মতো পুষ্টিকর খাদ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সরকারি খাদ্য মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থায় পুষ্টি-সংবেদনশীলতা উন্নতকরণ;

৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক বাজার সংশ্লিষ্ট তথ্যের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যপ্রবাহ পদ্ধতির উন্নয়ন;

৭. সার্বক্ষণিকভাবে একটি বাজার অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজমান রাখতে মানসম্মত খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ততা ও যোগান-দক্ষতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যপণ্যের বাণিজ্য সহজীকরণ, উদারীকরণ, সমন্বয় ও সুসংহতকরণ।

কৌশল ২.২ খাদ্য মূল্য শৃঙ্খল ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নতকরণ

খাদ্য প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়ের ধরন শুধুমাত্র বিপণন দক্ষতাই নয়, খাদ্যের চূড়ান্ত পুষ্টিমান এবং নিরাপদতাকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করে। খাদ্যের সার্বিক মূল্যমানে অপেক্ষাকৃত কম অবদান রাখলেও এমন ধরনের মধ্যবর্তী পদক্ষেপগুলোকে একত্রীকরণের মাধ্যমে মূল্য-শৃঙ্খলকে সংক্ষিপ্ত করে মূল্য সংযোজনে বাড়তি দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। বিশেষত নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এমন সব মূল্য সংযোজনমূলক ক্রিয়াকলাপগুলো খুঁজে বের করা দরকার যা তাদের সম্ভাব্য বিকল্প আয়ের উৎস তৈরি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের মান ও মূল্য শৃঙ্খলে দক্ষতা বৃদ্ধির সুবিধার্থে অধিকতর বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্যপণ্যের মান ও মূল্য-শৃঙ্খল বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের পক্ষে আকর্ষণীয় ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি সম্ভব হতে পারে। অসংগঠিত বাজারগুলো পুনর্গঠিত করে উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তাদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্যপণ্যের বিপণন চ্যানেল উন্নত করা প্রয়োজন।

নিরাপদ ও পুষ্টিদায়ক খাদ্যপণ্যের বিকাশ পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি। এই নীতি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত, পরিচালনামূলক এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা উন্নয়নে আগ্রহী ব্যক্তিদের সক্ষমতা জোরদার করবে। সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীকেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই) নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন মতো দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে। বেসরকারি খাতে খাদ্য-বাজার শৃঙ্খলে কয়েক লক্ষ পাইকার, মিলার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রয়েছে। যারা দেশ ব্যাপী খাদ্য ক্রয়, প্রক্রিয়া, মজুত, পরিবহন ও বিপণনের সাথে জড়িত। অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি উভয় বাজারের চাহিদা পূরণে আধুনিক ও পুষ্টি-সংবেদনশীল পদ্ধতিতে সংগ্রহ, মিলিং, পলিশিং, বাছাই, পরিষ্কার, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণ কৌশলগুলোর প্রচার, প্রসার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

খাদ্য ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত কাজে তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের সময়মত, পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য বাজার সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আইসিটি-ভিত্তিক বাজার তথ্য পদ্ধতি এ জাতীয় সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সময় উপযোগী উচ্চমানের তথ্য সরবরাহ করতে পারে। মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাজার তথ্যের সহজ সুযোগ খাদ্যপণ্য স্থানান্তর, পরিবহণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষক ও উৎপাদনকারীদের ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস করতে পারে। এই নীতি যথাযথ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে প্রচলিত বাজার ব্যবস্থা এবং আইসিটির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজারের তথ্যগুলোতে বর্ধিত অভিগম্যতাকে সহজতর করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. খাদ্যপণ্যের মূল্য শৃঙ্খলে দক্ষতা বৃদ্ধিকারক কার্যক্রম (যেমন- বিপণন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য বা মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা হ্রাস, ক্রেতা-বিক্রেতা ও বিপণন প্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপচয় হ্রাস) উদ্ভাবন ও প্রসার;

২. প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য সংযোজনের সুবিধাসহ আধুনিক জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণে আর্থিকভাবে সক্ষম ও স্বাবলম্বী ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা ও তাদের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;

৩. অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন এবং বিপণনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্যপণ্যের প্রস্তুত ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা অপসারণে অগ্রাধিকার প্রদান;

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আগাম-সতর্কতা ও বাজার তথ্যের অবাধ সরবরাহে দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কৌশল ২.৩ মূল্য শৃঙ্খলের সকল পর্যায়ে পুষ্টিগুণ সংরক্ষণ ও উন্নতকরণ

ফসল উত্তোলন পরবর্তী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন, বাণিজ্য, বিজ্ঞাপন এবং খুচরা বিক্রয়ের সকল পর্যায়ে খাদ্যপণ্যের পুষ্টি মানের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্যশস্য ও ডালের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে জার্মিনেশন ও মল্টিং পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ধিতভাবে পুষ্টি উপাদান (আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ) ও অধিকতর জৈব-লভ্যতা প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। অপরদিকে উষ্ণতার দীর্ঘায়িত প্রভাবের কারণে পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান এবং পরিমাণ উভয় ধরনের ক্ষতি রোধকল্পে এই নীতি উপযুক্ত খাদ্য সংরক্ষণের উত্তম অনুশীলন ও চর্চাসমূহের বিকাশ ও প্রচারকে সহায়তা করবে। একইভাবে, হিমায়িতকরণ, আচার ও জুস (রস) প্রস্তুতকরণ, কৌটাজাতকরণ ও পাস্তুরিতকরণের মাধ্যমে খাদ্যপণ্যের কার্যকর স্থায়িত্বকালের প্রসার খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ অনুশীলনের বিকাশকে সমর্থন করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. মূল্য শৃঙ্খলের সকল পর্যায়ে (পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, মজুত, পাইকারি, খুচরা বিক্রয়) পুষ্টিগুণ সংরক্ষণ;

২. সকল সম্ভাব্য ও কার্যকর ক্ষেত্রে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ (ফর্টিফিকেশন) ও পুষ্টি বৃদ্ধি কার্যক্রম সম্পাদন;

৩. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)-এর মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন এবং স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি পুষ্টি সংরক্ষণে সহায়ক লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশ নিশ্চিতকরণ;

৪. সকল প্রকার খাদ্যের নিরাপদ মান (safety standard) নির্ধারণ এবং তা প্রতিপালনে নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রচার, খাদ্যের পুষ্টিগত মান, নিরাপদতার মাত্রা ও শনাক্তকরণ চিহ্ন (traceability) সম্বলিত লেবেলিং পদ্ধতি এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের সুবিধার্থে যথোপযুক্ত কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণ, প্রসার ও প্রচার (উদ্দেশ্য ৫ এর সাথে সংযুক্ত);

৫. বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ-

(ক) খাদ্যের নিরাপদতা পরীক্ষা ও বাজার থেকে অনিরাপদ পণ্য প্রত্যাহার কার্যক্রম পরিচালনায় খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী, পরিবেশক, বিপণনকারী এবং খুচরা বিক্রেতাদের সাথে কার্যকর সংশ্লিষ্টতা এবং অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(খ) খাদ্য নিরাপদতার মান পরীক্ষা ও ফলাফল এবং অন্যান্য বিশ্লেষণধর্মী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অংশীজনের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন ও বিকশিতকরণ;

(গ) খাদ্যের মান ও মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন এবং সুবিধাজনক আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে অংশীদারিত্বমূলক তথ্যভাণ্ডার ও বাজার বুদ্ধিমত্তা (market intelligence) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তার।

কৌশল ২.৪ দরিদ্র ও খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি

গ্রামীণ দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। জমিতে গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার সীমিত হওয়ার কারণে তাদের আয়ের বৃদ্ধি মূলত কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের উপর নির্ভর করে। গ্রাম অঞ্চলে কৃষি-বহির্ভূত কার্যক্রমগুলো প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কুটির শিল্প, পরিবহন কার্যক্রম, মূল্য সংযোজনের জন্য কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত পরিষেবা, ছোট আকারের ব্যবসা এবং নির্মাণ। দক্ষতা বিকাশ, ঋণ প্রদান, পরিবহন অবকাঠামোগত উন্নতি এবং বিপণন সহায়তার মাধ্যমে এই নীতি গ্রামীণ অ-কৃষি অর্থনীতির আরও সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. গ্রামীণ যুবক ও নারীদের জন্য যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে কর্মমুখী প্রশিক্ষণের (যেমন, কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও সেবা) সুযোগগুলো বাড়িয়ে কৃষি এবং কৃষি বহির্ভূত কর্মক্ষেত্রের প্রসার ও প্রচার;
২. কৃষিভিত্তিক শিল্প ও গ্রামীণ কৃষি-বহির্ভূত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত ঋণ, প্রযুক্তি, তথ্যসেবাসহ অন্যান্য সহায়ক সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন এবং বিক্রয়ের সুযোগ তৈরি সহ ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে সমবায় ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশকে সমর্থন প্রদান;
৪. মূল্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে, বিশেষত নারীদের জন্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ত্বরান্বিতকরণ;
৫. প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেকোনো প্রকারের অযৌক্তিক বৈষম্য দূরীকরণ।

উদ্দেশ্য ৩: উন্নত পুষ্টিমান অর্জনকল্পে স্বাস্থ্যকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যই হচ্ছে উন্নত পুষ্টি, সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণের ভিত্তি। নিরাপদ এবং উন্নত মানের আমিষ ও অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য-ঘাটতির ফলে মানুষের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। বৈচিত্র্যময় খাদ্যপ্রাপ্তি একটি পরিবারের সকল ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অণুপুষ্টির সংস্থানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত।

শুধুমাত্র ক্যালরি-সমৃদ্ধ খাদ্যের পরিবর্তে পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ ফলমূল, শাক-সবজি, দুগ্ধজাত ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে বৈচিত্র্য আনার অন্যতম চালিকাশক্তি হল ভোক্তার সার্বিক ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও বিশ্বায়ন। সেই সাথে ভোক্তাদের খাদ্যের ধরন নির্ধারণে এ সকল চালিকাশক্তির নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সময়ের সাথে সাথে স্বল্প-পুষ্টিমান সম্পন্ন সহজলভ্য খাদ্য গ্রহণের মাত্রা বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ বিগত দশক থেকেই খাদ্য বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা চালিয়ে সুফল পাচ্ছে, তবে তা হচ্ছে ধীর গতিতে। 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' খাদ্য বৈচিত্র্য আনার প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে। এ লক্ষ্যে উচ্চ খাদ্যশক্তি অথচ স্বল্প পুষ্টিসমৃদ্ধ ও সহজলভ্য খাদ্য গ্রহণ নিরুৎসাহিতকরণে বিধি-নিষেধ প্রয়োগ, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য-সম্মত খাদ্যগ্রহণ জনপ্রিয়করণ, ভোক্তার সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে খাদ্য বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া উন্নয়ন ও পুষ্টিকর সুষম খাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থা উন্নতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

ভোক্তার খাদ্য নির্বাচন প্রায়শই ব্যক্তিগত জ্ঞান, স্বাদ, পছন্দ, আবেগ এবং ক্ষুধা মেটানোর প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো আবার ব্যক্তির সামাজিক পরিমণ্ডল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, স্থানীয় খাবার দোকানের উপস্থিতি, খাদ্যের ধরন ও মূল্যের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। এছাড়া, খাদ্য ব্যবস্থার সার্বিক রূপদানে সহায়তাকারী সরকারি নীতি-কৌশল ও আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের প্রচার প্রভাব ফেলে থাকে। এ সকল প্রভাব খাদ্য পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ভোক্তারা কী খাদ্য গ্রহণ করে তাতে তাদের ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারগুলোরও প্রভাব থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সার্বিক মূল্যবোধ তথা জনস্বাস্থ্য সচেতনতা, সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ, প্রাণি-কল্যাণ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে ভোক্তাদের অনেকেই খাদ্য বাছাই করেন।

কৌশল ৩.১: জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য সুপারিশকৃত মাত্রা অনুযায়ী টেকসইভাবে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন

দেশে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের পর্যাপ্ততা জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও জনমিতিক কাঠামোতে পরিবর্তন, নগরায়ণ ও আয়-বৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরূপ খাদ্য চাহিদার ধরনের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সর্বমোট খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। খাদ্য সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে প্রাক্কলিত ব্যবধান হ্রাস করতে সরকার বর্ধিত উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে। এছাড়া বিশেষত শহরাঞ্চলে আধুনিক ও সহজলভ্য খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন চলমান রয়েছে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. খাদ্যের যোগান ও পুষ্টি অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্যের চাহিদা ও ধরন নির্ধারণক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে কাঙ্ক্ষিত খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা প্রতিষ্ঠা;

২. জাতীয় পর্যায়ে সুষম খাদ্যের সংস্থানের জন্য বয়স, শারীরিক গঠন, লিঙ্গ, পেশা এবং কায়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ধরনভেদে শ্রেণিভিত্তিক চাহিদা মেটাতে জনপ্রতি খাদ্য শক্তি ও পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ;

৩. স্বাস্থ্যসম্মত ও সক্রিয় জীবন যাপনের জন্য মোট পুষ্টি চাহিদা বিবেচনায় রেখে পুষ্টির ঘাটতি বিশ্লেষণ করে জাতীয় পর্যায়ের চাহিদা মেটাতে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (বিশেষত চর, হাওড় ও পাহাড়ি এলাকায়) উৎপাদিত খাদ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বল্পতম মূল্যে পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন খাদ্যতালিকা প্রণয়ন ও প্রচার;

৫. সকলের জন্য পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই খাদ্য ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ উন্নয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহ বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

কৌশল ৩.২: পুষ্টি-জ্ঞান বৃদ্ধি, উত্তম খাদ্য চর্চার প্রসার এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহদান

বাংলাদেশের জনগণের উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত ম্যাক্রো-পুষ্টি (শর্করা, আমিষ, চর্বি এবং তেল) গ্রহণের পাশাপাশি লৌহ, ভিটামিন-এ এবং অন্যান্য অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ব্যয়-সাশ্রয়ী ও কার্যকর পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের শিক্ষা কর্মসূচি খাদ্য মূল্য শৃঙ্খলে জড়িত সকল পক্ষসহ (প্রস্তুতকারী, পরিবহনকারী এবং বিপণনকারী) ভোক্তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষত গৃহস্থালি পর্যায়ে খাদ্য প্রস্তুতির কাজে জড়িতদের (যেমন, সেবা প্রদানকারী নারী) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি গুরুত্ব প্রদান করবে। এছাড়া, শিল্পের গুণগত মান বৃদ্ধির কার্যক্রমকে হতে হবে বিস্তৃত খাদ্য কৌশলের একটি অংশমাত্র, যা পুষ্টিকর খাদ্য প্রবর্তন ও খাদ্যতালিকা বৈচিত্র্যকরণের সম্পূরক হবে। এছাড়া এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সুপারিশকৃত পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা ও চাহিদা মেটাতে বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত পরিপূরক খাদ্যসমূহ (সমৃদ্ধকৃত খাদ্যসহ) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্যের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিকল্প এমন প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নয়। অণুপুষ্টির অভাবজনিত অপুষ্টির দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনা করে শুধুমাত্র অণুপুষ্টির অভাবে সংকটময় অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অণুপুষ্টির অভাব হ্রাসকল্পে একটি কার্যকর খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি (প্রতিষ্ঠিত মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ) বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং অণুপুষ্টি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিকে আরও সুসংহত করা প্রয়োজন। গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধ-দানকারী মাতা এবং শিশুদের (মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে প্রথম ১০০০ দিনের জন্য) পুষ্টি অবস্থার উন্নতিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া উচ্চ আয়ভুক্ত তিন-পঞ্চমাংশের তুলনায় নিম্ন আয়ভুক্ত দুই-পঞ্চমাংশ পরিবারের শিশুদের মধ্যে অধিকতর খর্বতার হার বিরাজমান থাকায় নিম্ন আয়ের দুই-পঞ্চমাংশ পরিবারের শিশুদের খর্বতার হার কমাতে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তির জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতকরণ, উপযুক্ত রন্ধন পদ্ধতির প্রচলন এবং স্থানীয় মৌসুমি পুষ্টিকর খাদ্য সংমিশ্রণে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি পরিচালনা, প্রসার ও প্রচার;
২. কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্যের মান ও মূল্য শৃঙ্খল বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীসহ সকল সম্প্রসারণ সেবায় নিয়োজিতদেরকে জাতীয়ভাবে খাদ্য-ভিত্তিক পুষ্টি উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়ের কাজে ভূমিকা রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩. কিশোর-কিশোরী, নারী ও শিশুদের কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর খাদ্য মিশ্রণ, অণুপুষ্টি-সমৃদ্ধ স্থানীয় খাদ্য প্রস্তুত প্রণালির ব্যবহার, নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেল বিষয়ে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুষ্টি আচরণ পরিবর্তনকারী যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা;
৪. অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পুষ্টি শিক্ষা কৌশলসমূহ বৃদ্ধি;
৫. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে বয়স, লিঙ্গ ও বিশেষ শারীরিক অবস্থা (গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধ-দানকারী) এবং জাতীয় অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের আলোকে খাদ্য নির্দেশিকা তৈরি এবং তার প্রচার ও ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ।

কৌশল ৩.৩: নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীতকরণ

অপুষ্টির নানা ধরন আছে। সব ধরনের অপুষ্টির অনেক আন্তঃসম্পর্কিত মৌলিক, তাৎক্ষণিক ও অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে যার প্রভাব দূর করতে একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। অপুষ্টির নানা কারণও থাকে। এর অনেকগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য এবং নিরাপদ পানীয় জল প্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকারের সমস্যা, শিশু ও ছোট শিশুর অপর্যাপ্ত সেবা ও খাওয়ানোর চর্চা, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য পরিষেবার অপর্যাপ্ততা, দারিদ্র্য এবং নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থা দ্বারা সৃষ্টি হয়।
পুষ্টি গ্রহণ ও সঠিক ব্যবহার ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে, যা আবার পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশনসহ অন্যান্য কারণের উপর নির্ভরশীল। তাই পানি, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) উন্নতকরণে গৃহীত নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জোর দেওয়া দরকার। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের শর্ত পূরণ করা না হলে ডায়রিয়া, অন্ত্রের কৃমি ও পুষ্টি শোষণ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মানবদেহে মল-বাহিত জীবাণুগুলোর প্রবেশ সহজতর হয়। ঘনঘন অসুস্থতা পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতা বাড়িয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এবং অসুস্থতাসহ পুষ্টি অবস্থার অবনতির একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে। ব্যাকটেরিয়া, শিল্পবর্জ্য ও ভারী ধাতু (সিসা, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক ইত্যাদি) মুক্ত নিরাপদ খাদ্য ও পানির সংস্থানের উপর জোর দেবে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি। রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পরিস্থিতির উন্নতিতে নিশ্চিতভাবে অবদান রাখে। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে সরকার এনজিওদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এ ধরনের কর্মসূচি আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:
১. প্রতিষেধক প্রদান কর্মসূচি সম্প্রসারণ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, কলেরা ও ডায়রিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচির সম্প্রসারণ;
২. প্রসব পূর্ববর্তী সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা, শিশুর বৃদ্ধি পরীক্ষণ ও পরামর্শদান এবং জাতীয় পুষ্টি সেবার বাস্তবায়ন জোরদার করা, কমিউনিটি ক্লিনিককে যুক্ত করা, শিশু এবং নারীদের ক্রমাগত দুর্বলতা এবং অণুপুষ্টির ঘাটতি থেকে রক্ষা;
৩. পান করার জন্য ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানির সরবরাহ বৃদ্ধি;
৪. স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার প্রস্তুতি, প্রদর্শন ও পরিবেশন এবং সঠিকভাবে হাত পরিষ্কার করাসহ উত্তম ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চা বৃদ্ধিতে প্রচারণামূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণ;
৫. পরিবেশগত ও মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষাকল্পে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিকিৎসা-বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ ও পুনরায় ব্যবহারের উপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সাধন;
৬. খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রাণি থেকে মানবদেহে সংক্রমণযোগ্য রোগ প্রতিরোধসহ বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি ও উত্তম স্বাস্থ্যবিধি চর্চার উন্নতি সাধন।

উদ্দেশ্য ৪: দুর্যোগ প্রবণ, দুর্গম অঞ্চলস্থ দুস্থ জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে জীবন চক্রব্যাপী পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধিকরণ

দারিদ্র্য ও ক্ষুধা অবসানের লক্ষ্যে সকল শ্রেণি ও বয়স ভেদে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়া রোধকল্পে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রাকৃতিক, স্বাস্থ্যগত বা আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে স্বল্পকালীন বা মৌসুমি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে জীবন চক্রব্যাপী সামাজিক সুরক্ষা এবং খাদ্য-ভিত্তিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে সরকারি সমর্থন অব্যাহত রাখতে 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক সুরক্ষা এবং খাদ্য-ভিত্তিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় পরিচালিত মিশ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অভিঘাতের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি থেকে দরিদ্র ও অরক্ষিতদের পুনরুদ্ধার করা জরুরি। এ জন্য সামাজিক সহযোগিতার পাশাপাশি অভিঘাতের ক্ষতি প্রতিরোধমূলক দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি কার্যক্রমসমূহকে অধিকতর শক্তিশালীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া, সরকারি খাতে খাদ্য সংগ্রহ, মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের সাথে সু-সমন্বিতকরণের মাধ্যমে আরও কার্যকর এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা দরকার।

বন্যা, খরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রবণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সাধারণত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এ ক্ষেত্রে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর প্রভাবকগুলো ক্ষণস্থায়ী হলেও, এর ফলে বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পতিত হয়। অভিঘাতগুলো সাধারণত দ্রুততার সাথে উৎপাদনশীল সম্পদের ক্ষয় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটানোর পাশাপাশি কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ব্যাহত করে। এতে তাদের ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতাও অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হতে পারে। এ সকল কারণে তাৎক্ষণিক অভিঘাত ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর ও টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ধরনের নিরাপত্তা বেষ্টনী শুধুমাত্র স্বল্পস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা রোধের ক্ষেত্রেই নয়, স্বল্পস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় রূপান্তর এড়ানোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অন্যান্য অরক্ষিত গোষ্ঠী যথা - শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অথবা শহুরে বস্তিতে বসবাসকারী বাস্তুচ্যুতরা দীর্ঘকালীন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে। এ সকল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে একটি সু-পরিকল্পিত ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপস্থিতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এছাড়া কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষিতে দুর্যোগ প্রশমন করে এমন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কৌশল ৪.১. সরকারি খাদ্যশস্য মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ

বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকারি খাদ্যশস্য মজুত ও বিতরণ ব্যবস্থা (বিশেষত প্রধান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে) একটি প্রধান 'প্রতিরক্ষামূলক' ভূমিকা পালন করে আসছে। এটি তিনটি উপায়ে ভূমিকা রেখে থাকে: (ক) সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের সহায়তা প্রদান; (খ) বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বা দুর্মূল্যের সময়ে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ভোক্তাদের সহায়তা প্রদান; এবং (গ) দুর্যোগ-কবলিত এলাকায় এবং দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য সরাসরি ত্রাণ সহায়তা বা সরকারি খাদ্য সহায়তা প্রদান। সাধারণত উৎপাদক ও ভোক্তা উভয় পক্ষই খাদ্যের বিরাজমান প্রত্যাশিত বাজার মূল্য থেকে উপকৃত হয়ে থাকে। দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদান করতে নিবিড় সংগ্রহ এলাকার গড় উৎপাদন ব্যয়ের থেকে কিছুটা উচ্চ স্তরে সরকারি সংগ্রহ-মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সরকারি খাদ্য মজুত ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত গুদামজাতকরণ ও মজুত সংরক্ষণের আধুনিক সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে সরকার ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও সম্পন্ন করেছে। এ ক্ষেত্রে সরকার উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থরক্ষায় ভারসাম্য বজায় রেখে খাদ্যপণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নতা ঠেকাতে বাজার সহায়ক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সরকারি খাদ্য ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে। বাজার ব্যবস্থার স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি না করেই এটা করা সম্ভব। সরকারি গুদামে সংরক্ষিত পুষ্টিসমৃদ্ধ চালসহ খাদ্য পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক ও সহায়ক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এছাড়া খাদ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ,

বাণিজ্য প্রসার ও বিতরণ সুবিধা আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. সরকারি খাদ্য বিতরণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সরকারি খাদ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য মজুতের পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ক্রয়, উৎপাদন সহায়তা প্রদান এবং খাদ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে বাজার সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ;

২. সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে বাণিজ্যিক আমদানির সাথে সমন্বয় করে (দেশীয় উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমদানি নিরুৎসাহিত করাসহ) সময়মত ও দ্রুততার সাথে দুর্যোগ মোকাবিলা করার কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণ;

৩. সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় মজুতকৃত খাদ্যপণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. ফটকা কারবারির মাধ্যমে খাদ্যপণ্য মজুত এবং কৃত্রিমভাবে খাদ্য সংকট সৃষ্টি নিরুৎসাহিতকরণ ও এরূপ কার্যক্রম বন্ধ করতে উপযুক্ত আইনি বিধিবিধান চালুকরণ;

৫. নিয়মিতভাবে খাদ্য শস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বাজার মূল্য, মজুত এবং আমদানি পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ;

৬. সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের মাধ্যমে দরিদ্র ও অরক্ষিত ভোক্তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে যৌক্তিক পর্যায়ে মূল্য সহায়তা প্রদান।

কৌশল ৪.২. দুর্যোগ প্রশমনমূলক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, পুনর্বাসন ও মোকাবিলা ব্যবস্থার উন্নয়ন

এই কৌশলের আওতায় দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার কৃষকদের উৎপাদনশীল ক্ষমতা দ্রুত ফিরে পেতে সহায়তা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে রক্ষার জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিচালনাকে স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। এ ক্ষেত্রে কৃষি অভিযোজন ও বহুমুখীকরণ কর্মকাণ্ড দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অসমর্থ পরিবারগুলোকে সহায়তা (যেমন, ঝুঁকি হ্রাস) প্রদানে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, দুর্যোগ-কবলিত এলাকায় সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব উপশমের ক্ষেত্রে একটি মূল উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়া, সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমে খাদ্যশস্যের পাশাপাশি ডাল, বাদাম, ভোজ্য তেল, মাছ ও শুঁটকির মতো পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্তকরণের উপায় খুঁজে বের করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই সর্বজনীন খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি জেন্ডার বিবেচনার উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয় না। পারিবারিক পর্যায়ে প্রাপ্ত খাদ্যের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষত সঠিকভাবে খাদ্য নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ এবং শিশুর যত্নে পারিবারিক স্বাস্থ্যচর্চায় নারীর প্রয়োজনীয় ভূমিকা বিবেচনা করে কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা নিশ্চিতকল্পে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ রেখে সরকারি খাদ্য মজুত নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালন করা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, সরকারের পাশাপাশি দুর্যোগকালে দুস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে কার্যকরভাবে খাদ্য বিতরণে বেসরকারি সংস্থাসমূহেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। সংকটকালীন খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দুর্যোগকালীন সময়ে দ্রুত ত্রাণ সরবরাহের জন্য যথাস্থানে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত গড়ে তুলে তার যথাযথ সংরক্ষণ করা দরকার। পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, খরা ও বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের ভূ-স্থানিক মানচিত্রায়ণের (GIS) মাধ্যমে দুর্যোগের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনসংখ্যা কাঠামো, আয় ও পুষ্টিগত দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট জাতীয় তথ্যভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে পারিবারিক স্তরের তথ্যের সাথে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের তথ্য সংযোজন করলে তা নিরাপত্তা বেষ্টনীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে একটি শক্তিশালী উপায় হতে পারে। এছাড়া, একক জাতীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা (single registry system)-এর আওতায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রেও ফলদায়ক হতে পারে। একটি শক্তিশালী দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা

পরিচালিত হলে প্রবল দুর্যোগ ও প্রকট খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলাতেও সহায়তা করে। পুষ্টি ও জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থা পরিচালনায় কাঠামোগত বা কাঠামো বহির্ভূত উভয় ধরনের উন্নয়নই গুরুত্বপূর্ণ। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। খরার কারণে ফলন হ্রাস-রোধে পরিপূরক সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণের পাশাপাশি নিমজ্জন ও খরা সহনশীল জাত উদ্ভাবন ও প্রসার, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমও দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. প্রতিকূল ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ও স্বল্প সময়ে উৎপাদনক্ষম শস্য, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসজাত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসব উৎপাদনে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
২. সকল দরিদ্র পরিবার বিশেষত দরিদ্র কৃষক ও খামারিদের ক্ষেত্রে দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দরিদ্রদের বসত বাড়িতে ফসল ও প্রাণিপালনে সহায়তা প্রদানসহ 'একটি বাড়ি, একটি খামার' জাতীয় ব্যবস্থার প্রসার;
৩. সরকারি খাদ্য মজুতের সময়োপযোগী ও কৌশলগত সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ কবলিতদের মাঝে দ্রুততার সাথে বিতরণ ছাড়াও বাজারে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ও দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রশমন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা সুসমন্বিতকরণ;
৪. দুর্যোগ-আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষত নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের গুরুত্ব দিয়ে আপৎকালীন সময়ে বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ নিরাপদ খাদ্য ও পানি সরবরাহ এবং সু-স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান;
৫. পুষ্টিগত দিক দিয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় সুরক্ষা কৌশলের লক্ষ্য নির্ধারণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

কৌশল ৪.৩. অসমর্থ ও বাস্তুহারাসহ ঝুঁকিপূর্ণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ

জীবন চক্রব্যাপী সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর দ্বারা সকলের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে এই কৌশলটির কার্যকর ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জীবনচক্রের সাথে সংযুক্ততার কারণে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনীমূলক উদ্যোগ জীবনের নানা পর্যায়ের (যেমন-গর্ভাবস্থা, প্রসূতিকাল, শৈশব, কৈশোর বা প্রৌঢ়াবস্থা) জৈবিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখে। তাই পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে পুষ্টির প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে এসব উদ্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাব ফেলে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, গ্রামীণ ও কৃষির রূপান্তর এবং পরিবর্তনশীল বৈষম্যের কারণে অনেক মানুষ কর্মহীন হতে পারে এবং এরা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে। নির্ভরযোগ্য ও অনুমিত সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীসমূহে সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের (যেমন- বয়স্ক, দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী) অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলোকে আরও সুফলদায়ক করা সম্ভব। সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর ভিত্তি করে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হয়। যেমন- ভৌগোলিক (প্রত্যন্ত বা দরিদ্র পীড়িত অঞ্চল), মৌসুমি (ফসল তোলার পূর্ববর্তী সময়) এবং বিপর্যয়ের তীব্রতা (ব্যাপক বন্যা বা খরা)। লক্ষ্য নির্ধারণের এই বিষয়গুলো কিছু ক্ষেত্রে একে অন্যের সীমা অতিক্রম (overlapping) করতে পারে। একইভাবে অতি দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ এবং কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

এই কৌশল সকল অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অভীষ্ট করে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা এবং নগদ সহায়তার পরিপূরক হিসাবে খাদ্য সহায়তা ও প্রশিক্ষণ সুবিধাকে যুক্ত করে পুষ্টি সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে রূপরেখা প্রণয়নে সাহায্য করবে। সামাজিক বীমা সুবিধাগুলোর জন্য রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে গর্ভবতী নারী ও মাতৃদুগ্ধ দানকারী মাতাদের মতো পুষ্টির দিক দিয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়াতে এই কৌশল সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. অরক্ষিত ও অনগ্রসর এলাকায় বসবাসরত অসমর্থ ও বাস্তুহারা জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী শক্তিশালীকরণ;
২. পুষ্টির দিক থেকে অরক্ষিত দল বিশেষত মা ও শিশুদের জন্য পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচিসহ উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন;
৩. মৌসুমি অভাবের সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সাথে কৃষি উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং খাদ্যপণ্যের ব্যবসা উন্নয়নের উদ্যোগসমূহের যথাযথ সমন্বয়সাধন ও সহযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য ৫: খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তঃ-খাত কাঠামোর উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও অংশীজনদের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কার্যকর রূপরেখা প্রণয়ন এবং নীতি ও কর্মসূচির বাস্তবায়নে বহুখাত-ভিত্তিক পরিকল্পনা, সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন বাঞ্ছনীয়। এটা পুষ্টির ফলাফল সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে দরকার। নীতি-কৌশল ও কর্মসূচিসমূহ পরস্পর সংগতি করতে সেগুলোর সময়ানুগ ও কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সময়ের ধারাবাহিকতায় কৌশলগুলোকে যথাযথভাবে হালনাগাদ করে অধিকতর কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সামগ্রিক সুশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন। বহু খাত-ভিত্তিক কার্যক্রমসমূহকে (যেমন- মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিমূলক উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, প্রস্তুতকরণ ও খাদ্য গ্রহণ) সকল আঙ্গিক থেকে জেন্ডার ও পুষ্টি সংবেদনশীল করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বহুখাত-ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। একইভাবে, খাদ্যের ক্ষতি এবং অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত মান-ভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (যেমন-রাসায়নিক, ট্রেস উপাদান, ভারী ধাতু, ক্ষতিকর অণুজীব এবং তাদের উৎস থেকে খাদ্য দূষণ মুক্তকরণে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণধর্মী কার্যকলাপের মাধ্যমে নজরদারি ব্যবস্থা ও নিরাপদ খাদ্য আইনে চিহ্নিত অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে শাস্তি-বিধান বাঞ্ছনীয়। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির এই উদ্দেশ্য অর্জনে সরকার নিম্নোক্ত কৌশলাদি গ্রহণ করবে।

কৌশল ৫.১ খাদ্য নিরাপদতা উন্নতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য নিরাপদতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সার্বিক উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান বর্তমানে একটি ক্রমবর্ধমানভাবে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চিন্তা। বিভিন্ন উৎসের খাদ্য রাসায়নিক, অতিক্ষুদ্র ট্রেস-উপাদান, ভারী ধাতু ও ক্ষতিকর অণুজীব দ্বারা দূষিত হয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে দূষণমুক্ত করে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত খাদ্য নিরাপদতার মান অনুসারে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে সহায়ক কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পরিচালনার মাধ্যমে নাগরিকদের আশ্বস্ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'খাদ্য অধিকার' হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নীতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে, নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে গৃহীতব্য নিয়ন্ত্রণধর্মী কার্যকলাপের যৌক্তিকভাবে নজরদারি ব্যবস্থা পরিচালনা করে চিহ্নিত অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে শাস্তি বিধান এবং একই সঙ্গে খাদ্য প্রতারণা ও দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) অধীনে স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি এবং বাণিজ্যে কারিগরি বাধা (Technical Barrier to Trade) সংশ্লিষ্ট চুক্তি এবং কোডেক্স আলিমেনট্যারিয়াস কমিশন (Codex Allementarious Commission)-এর সদস্য হিসেবে নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকরণে স্বাক্ষরকারী দেশ। তাই খাদ্য উৎপাদন থেকে গ্রহণ পর্যন্ত পুরো খাদ্য শৃঙ্খলে উত্তম চর্চার ব্যবহার ও দূষণ রোধের পাশাপাশি খাদ্য বিতরণের সঙ্গে জড়িত সকল স্বাস্থ্য-ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রতিরোধে অগ্রাধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. সনদ প্রদানকারী, পরিদর্শনকারী ও সত্যতা যাচাইকারী সংস্থাসমূহের অ্যাক্রেডিটেশনের দ্বারা নিরাপদ খাদ্যমানের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে সম্মতি প্রদান ব্যবস্থা (compliance) উন্নয়ন ও পরিচালনা নিশ্চিত করা;
২. খাদ্য নিরাপদতার জন্য যথাযথভাবে স্বীকৃত ল্যাবরেটরিসমূহের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সেবা সম্প্রসারণ;
৩. খাদ্য দূষণ ঝুঁকি বিশ্লেষণের ফল প্রকাশ, প্রচার এবং ভারী-ধাতু, মাইকোটক্সিন ও দূষকমুক্ত খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি;
৪. প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদন কার্যক্রম (যেমন- উত্তম কৃষি চর্চা, উত্তম মৎস্য চর্চা, উত্তম প্রাণি-পালন চর্চা) এবং মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদনে উত্তম পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপদতা ও মান সংরক্ষণ পদ্ধতি উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচার;
৫. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে উত্তম উৎপাদন চর্চা, উত্তম স্বাস্থ্যবিধি চর্চা এবং বিপত্তি-বিশ্লেষণ ও সংকট নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (HACCP) কমপ্লায়েন্ট হওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে সহায়ক অনুশীলন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;
৬. শস্য, প্রাণি ও মৎস্যজাত পণ্যের (উদ্দেশ্য-২ এর সাথে সংশ্লিষ্ট) নিরাপদতা ও গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানসহ দূষণ উৎসের সন্ধান লাভে (tracability) লাগসই পদ্ধতির বিকাশ, উন্নয়ন ও তার যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;
৭. উৎপাদন ও খাদ্য বিপণন শৃঙ্খলে ক্ষতিকারক সংরক্ষণ-উপকরণ (প্রিজারভেটিভ) এবং বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
৮. নিরাপদ খাদ্য আইন ও প্রবিধানের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আমদানিকৃত খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সংগ-নিরোধ ও আমদানি নীতি আদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীর সাথে সমন্বয় করে নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;
৯. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে শিক্ষা ও ভোক্তা সচেতনতা উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপদতার বিষয়ে ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, ফলাফল পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশ।

কৌশল ৫.২ খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপচয় হ্রাস

খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতির কারণে পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক মূল্য হ্রাস পায়। খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপচয় পরোক্ষভাবেও নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। ফসল আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন এবং বিপণনের সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে খাদ্য নষ্ট হয়। খাবার প্রস্তুত করার আগে গৃহস্থালি পর্যায়ে মজুতকালে অতিরিক্ত হারে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ঘটে থাকে। খাদ্য বর্জ্য বলতে সাধারণত বাড়িতে, হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং ক্যাটারিং-সেবায় সংঘটিত টেবিল বর্জ্যকে বোঝায়। বিভিন্ন পন্থা এবং কৌশলের মাধ্যমে মূল্য শৃঙ্খলে কার্যকরী সব পর্যায়ে ঘটতে থাকা ক্ষতি হ্রাস অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

খাদ্যের ক্ষতি ও অপচয় রোধে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. ফসল উত্তোলনে সঠিক সময় ও আহরণ প্রযুক্তি নির্ধারণ এবং খামার-পর্যায়ে মজুত কার্যক্রমে উন্নত পদ্ধতি ও অব-কাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যের ক্ষতি হ্রাস ও অপচয় (পুষ্টিমান অপচয়সহ) রোধ নিশ্চিতকরণ;
২. বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বনে উদ্ভাবিত ব্যয়-সাশ্রয়ী লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য ক্ষতি ও অপচয় হ্রাস কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উত্তম পদ্ধতি ও আচরণ অনুশীলন জোরদারকরণ (উদ্দেশ্য -২ এর আওতায় উৎপাদন-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, প্যাকেজিং, মজুত, বিপণন এবং অব্যবহৃত খাদ্য পুনর্ব্যবহার সম্পর্কিত);
৩. খাদ্য অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেরা অনুশীলন ও অভ্যাসসমূহ অনুসরণ করে ব্যবহারিক জ্ঞান, শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রচার বৃদ্ধিকরণ;
৪. খাদ্য অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবহারিক জ্ঞান, শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রচার বৃদ্ধিকরণ।

কৌশল ৫.৩ তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং বৃহত্তর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নীতিমালা ও কর্মসূচির হালনাগাদ পরিসংখ্যান ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম উন্নতকরণ

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নে বিশ্লেষণভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক ও বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন-পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলসমূহের

যথাযথ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। সময়মত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে নীতি বিকল্প বা পছন্দসমূহ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মূলনীতি হচ্ছে, প্রমাণভিত্তিক নীতি-পরিকল্পনা, বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ ও সংলাপের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতার সঙ্গে নীতি পছন্দসমূহের বাছাই, পর্যালোচনা ও জবাবদিহিতা পদ্ধতির উন্নয়ন। নীতি বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে করে তাদের পরিচালিত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া নীতি-সুপারিশসমূহ সরকারি নীতি-নির্ধারণী কার্যক্রমে প্রমাণ-ভিত্তিক ও বিশ্লেষণাত্মক ফলাফল প্রাপ্তিতে অতিরিক্ত উৎস হিসেবে অবদান রাখতে পারে। এ কারণে, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সমর্থনে বাড়তি সক্ষমতা প্রাপ্তিতে সরকার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্লেষণাত্মক ও নীতি-পরিকল্পনা কার্যক্রমে অবদান রাখার সক্ষমতা ও সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও সহায়তা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, সমন্বয়, সামঞ্জস্যকরণ ও বৈধকরণ, বিনিময় ও প্রসার এবং উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদকৃত তথ্য, পরিসংখ্যান, বিশ্লেষণ ও পরামর্শপত্র প্রণয়ন ও প্রচার;

২. খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা ও মূল্য সংশ্লিষ্ট পূর্বাভাস প্রদানের জন্য ‘বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার (Big Data)’-ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩.খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি, পুষ্টিগত ফলাফল এবং প্রভাবের উপর নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ;

৪. একটি ক্রিয়াশীল, সুসংহত ও পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত অগ্রাধিকার মেটাতে সক্ষম এমন কর্মপরিকল্পনার নকশা উপস্থাপন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও পদক্ষেপসমূহের সার্বিক সমন্বয়;

৫. বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাত (ব্যক্তি খাত, সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদির সাথে পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিগুলোকে যুক্তকরণে সহায়তা প্রদান;

৬. জাতীয় আর্থসামাজিক উন্নয়ন কৌশলাদিতে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের প্রতিশ্রুতির সপক্ষে নীতি-পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা সুসংহতকরণ।

কৌশল ৫.৪ খাদ্য ব্যবস্থায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিচালন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার ভূমিকার উন্নয়ন

নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ বাজারের আচরণ ও কর্মক্ষমতা উন্নতি করতে প্রবিধান প্রয়োজন। এ সকল আইনি নির্দেশনা ও নিয়মকানুন যাতে কার্যকর হয়, তার জন্য বাধ্যবাধকতামূলক (কমপ্লায়েন্স) কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বিদ্যমান নির্দেশনা ও নিয়মকানুন হালনাগাদ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে নতুন কিছু নিয়ম-পদ্ধতি গড়ে তুলবে।

জলবায়ু অভিঘাত সহনশীলতা বলতে জলবায়ু সংক্রান্ত আঘাতকে প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতাকে বোঝায়। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভিঘাত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চাপ-সহনশীল (খরা, জলমগ্নতা, উষ্ণতা বা শীতলতা) বিভিন্ন জাতের ফসল এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুশীলনের (উদ্দেশ্য ১ এর সঙ্গে সংযুক্ত) মাধ্যমে জলবায়ুর অভিঘাতের ক্ষতি প্রতিরোধ ও পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা উন্নত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শস্য এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধাসমূহ গ্রহণকল্পে শস্য ও কৃষি কার্যক্রমকে প্রয়োজনমাফিক বিকল্প ধারায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উৎপাদকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে তাদের অভিঘাত সহিষ্ণুতা উন্নতকরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ‘জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি’ উন্নত প্রযুক্তির সংস্থানের মাধ্যমে জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণুতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন উৎপাদন কার্যক্রমের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে তুলনামূলক সুবিধা নির্বাচন, আর্থিক

ও অন্যান্য সরকারি সহায়তা প্রাপ্তির (যেমন- কৃষি বীমা, ক্ষুদ্র ঋণ ও দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচি) ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কৃষক ও খামারিদের কমিউনিটি গড়ে তোলায় জোর দিয়েছে।

জেন্ডার-মেইনস্ট্রিমিং হল একটি আন্তঃ-খাত (ক্রস কাটিং) উপাদান, যা খাদ্য ব্যবস্থা ও মূল্য-শৃঙ্খলের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি বিষয় হতে পারে; যেমন- নারীরা খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং পুষ্টিকর খাবার আহরণ ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রভাবক অথবা মূল ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে, জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্য নারীর উৎপাদনশীল অবদান সীমিত করে এবং তাদের নেতিবাচক পরিস্থিতিতে ফেলে। নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থায়নের ব্যবস্থা যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং জেন্ডার-ভিত্তিক অসাম্য ও বৈষম্য মোকাবিলায় জেন্ডার-মেইনস্ট্রিমিংয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি খাদ্যব্যবস্থা ও মূল্য-শৃঙ্খলের সব আঙ্গিক থেকেই জেন্ডার-মেইনস্ট্রিম-মূলক প্রচারণা বৃদ্ধি করবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. দক্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও খাদ্য নিরাপদতা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া পরিচালনার পাশাপাশি খাদ্য বাজার ব্যবস্থাপনা ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ, প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন, মাতৃদুগ্ধ বিকল্প ও পরিপূরক শিশু খাদ্যসংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রতিপালন এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, খাদ্য মূল্য স্থিতিশীলকরণ, খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা, জৈব-নিরাপদতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট নীতি ও কৌশলাদির কার্যকর বাস্তবায়ন;
২. জেন্ডার-ভিত্তিক জ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বাজারে নারীদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিতে জেন্ডার-ভূমিকা জোরদারকরণ;
৩. খাদ্য ব্যবস্থায় জলবায়ু-অভিঘাত সহনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে লাগসই পদ্ধতির বিকাশ, উন্নয়ন, প্রসার ও উন্নতকরণ।

কৌশল ৫.৫ অংশীজন সমন্বয়ে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিতে শাসন পদ্ধতি, নীতি-সংগতি, সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ ও নেতৃত্ব জোরদার করণ

উন্নয়ন কর্মসূচি ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণকালে নীতিগত অগ্রাধিকারগুলো একত্রিত করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার সক্ষমতা জোরদার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতিসহ খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট সকল কৌশলপত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বারা কার্যকর করা হবে। এছাড়া নীতি পরিবর্তনের কার্যকারিতা ও প্রভাব পর্যালোচনার জন্য একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার কার্যকর কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করা জরুরি। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থা 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' বাস্তবায়নে তাদের সক্ষমতার ঘাটতি নিরূপণ করবে ও ঘাটতি পূরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সমন্বিত কার্যক্রমকে স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃতকরণসহ ফলাফল পর্যবেক্ষণ, কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকারি খাতে বিরাজমান সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা একটি বড় বাধা হিসেবে দেখা দিতে পারে। বিনিয়োগ কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশলে প্রয়োজনীয় সংশোধনক্রমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির কাম্য ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে।

বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট শাসন-কাঠামোর শীর্ষে রয়েছে 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)', যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিবগণের সমন্বয়ে গঠিত ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এফপিএমসি'র সভায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সব দিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা, সমন্বয় ও ফলাফল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদুপরি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির আওতাভুক্ত কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনে স্থানীয় পর্যায়ের (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) কার্যালয়সহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি সংস্থা ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)'র মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে।

অপর্যাপ্ত বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা, সীমিত মানবসম্পদ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতার ফলে অ্যাড-হক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ কারণে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণে বেসরকারি খাত, রাষ্ট্র-বহির্ভূত সহায়ক প্রতিষ্ঠান এবং প্রভাবক ক্ষেত্রগুলোকে যুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে এফপিএমইউ'র নেতৃত্বাধীন সমন্বয় ব্যবস্থা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এ ক্ষেত্রে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা উন্নয়ন করার জন্য নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা দৃঢ়করণ হল আরেকটি দুর্ভেদ্য চ্যালেঞ্জ, যা একটি যথাযথ সমন্বয় কৌশল প্রণয়ন করে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বহু খাত-ভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে গৃহীতব্য কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে নীতি সংগতি প্রতিষ্ঠা। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি এমন একটি কাঠামো তৈরি করবে যা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে নীতি সংগতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহ উন্নত করাসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময় এবং খাদ্য ও পুষ্টি অবস্থার পরিবর্তনশীলতা বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার;

২. নীতি-গ্রহণ, পুষ্টি নেতৃত্ব এবং প্রাসঙ্গিক সচিবালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সুদৃঢ় করা;

৩. আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয়সহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সকল ক্ষেত্র জুড়ে নীতি-সংগতি প্রতিষ্ঠা করা;

৪. স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, মাঠ প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থা (সামাজিক ও ব্যক্তি খাতসহ) এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও যৌথ প্রচেষ্টার উন্নয়ন;

৫. সরকারি খাতের প্রযুক্তি ও জ্ঞান স্থানান্তরের সুবিধা দিয়ে বেসরকারি খাতকে শক্তিশালীকরণ;

৬. ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি প্রতিনিধিত্বকারী সমন্বয়ক সত্তা গঠন ও কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিতকরণে সরকারের পক্ষ থেকে সহায়ক ভূমিকা পালন, যাতে করে বিচ্ছিন্নভাবে কার্যরত গোষ্ঠী-সত্তাগুলোকে একত্রিত করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখার সুযোগ বৃদ্ধি ও যৌথ প্রচেষ্টাসমূহ সুসংহত করা যায়;

৭. বেসরকারি খাত ও সামাজিক সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সরকারি সমর্থন প্রদানের পাশাপাশি তাদের তথ্য-ভিত্তিক বিশ্লেষণ সক্ষমতা উন্নয়নে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান:

   ক. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সমন্বয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ;

   খ. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র, ব্যবসায়িক ক্ষেত্র এবং প্রভাবক এলাকার আর্থসামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে একটি তথ্য, জ্ঞান ও বিশ্লেষণধর্মী নীতিগত অবস্থান গ্রহণ-পূর্বক কার্যকরভাবে নীতি নির্ধারকদের সাথে চলমান ও আসন্ন বাস্তবতার নিরিখে মত বিনিময়ের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের অবদান রাখার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ;

৮. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অংশীজনদের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো তৈরি ও উন্নয়ন এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (পিটুপি) ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) কার্যক্রমে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে কাঙ্ক্ষিত উপযোগিতা (value for money) প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

৬. নীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সকল ক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব দান করছে পুনর্গঠিত 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি' (এফপিএমসি)। এফপিএমসি বর্তমানে সকল পরিকল্পনা, সমন্বয় ও মনিটরিং-এর ম্যান্ডেট নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ও পরিচালন কাঠামোর শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সময় একই শাসনতান্ত্রিক কাঠামো অনুসরণ করা হবে। এফপিএমসি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারি সংস্থার খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সার্বিক নেতৃত্ব ও উপদেশ প্রদান করবে। প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় সামাজিক সংস্থা ও বেসরকারি খাতের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও আন্তঃমন্ত্রণালয় সংস্থাসমূহের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)-এর বর্তমান কাঠামোতে রয়েছে দশটি মন্ত্রণালয় (খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)। এসব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের বেশির ভাগই খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। যেহেতু জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির কেন্দ্রীয় একটি অঙ্গ হিসেবে উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেহেতু ভবিষ্যতে এফপিএমসি'র সদস্যপদ সম্প্রসারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়সহ 'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ'কে এফপিএমসি'তে অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনাযোগ্য। এই নীতি বাস্তবায়নকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ ও পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাসময়ে এফপিএমসি'তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হবে, যাতে করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এফপিএমসি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সার্বিক নেতৃত্ব প্রদানের ভূমিকা সফলভাবে পালন করতে পারে।

চ. উপসংহার

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি'র মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন। এ কারণে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প, কর্মসূচি, কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হবে। বহু খাত-ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের ফলাফল হিসেবে উন্নত পুষ্টিমান অর্জনে ভূমিকা রাখার বিষয়টিকে এই নীতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এলক্ষ্যে, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জনে সহায়তাকারী সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসহ স্থানীয় সরকার, জাতিসংঘ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের আওতায় বর্তমানে পরিচালনাধীন এবং ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সকল প্রকল্প, কর্মসূচি, কর্ম-পরিকল্পনা, কৌশল ও নীতিসমূহকে 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ করা হবে। সর্বোপরি স্থানীয় পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে সমন্বয় সাধন, সহযোগিতা উন্নয়ন ও যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়নধর্মী কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন চলমান রেখে সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আশা করা যায় যে, 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি'র কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ সকলের জন্য কাঙ্ক্ষিত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে সফল হবে।

সংযুক্তি - ‘ক’

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির পরিপূরক প্রাসঙ্গিক নীতিসমূহ

১. জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮
২. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৮
৩. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৭
৪. দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ২০১৭
৫. অসংক্রামক রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে বহু-খাত-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৮
৬. কিশোর স্বাস্থ্য উন্নয়নে জাতীয় কৌশল, ২০১৭
৭. সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৬
৮. পানি বিধিমালা, ২০১৬
৯. জাতীয় শিল্প নীতি, ২০১৬
১০. আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮
১১. অণু-পুষ্টি ঘাটতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশল, ২০১৫
১২. জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা (খসড়া), ২০১৫
১৩. জাতীয় পুষ্টি নীতি, ২০১৫
১৪. পানি আইন, ২০১৩
১৫. জাতীয় খাদ্য নীতি ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯
১৬. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা, ২০০৯
১৭. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
১৮. জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি, ২০০৭
১৯. জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন কৌশল, ২০০৬
২০. জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্ম-পরিকল্পনা, ২০০৫
২১. জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯
২২. জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮
২৩. জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়ন কৌশল, ১৯৯৮

নীতি প্রণয়নের জন্য অনুষ্ঠিত কারিগরি আলোচনার তারিখ ও স্থানের তালিকা

২০ জানুয়ারি ২০১৯ - এফপিএমইউ কনফারেন্স রুম; এফপিএমইউ-আইএফপিআরআই- এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি -২০১৯ প্রণয়নে কারিগরি আলোচনা সভা

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ - এপিএসইউ কনফারেন্স রুম; এপিএসইউ - জিওবি - আইএফপিআরআই -এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০১৯ প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি আলোচনা সভা

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ আইপিএইচ কনফারেন্স রুম; বিএনএনসি- জিওবি -উন্নয়ন সহযোগী-এনজিও-এমইউসিএইচ; বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের (বিএনএনসি) সঙ্গে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের কারিগরি আলোচনা সভা

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল; এফপিএমইউ- খাদ্য অধিদপ্তর -আইএফপিআরআই- এমইউসিএইচ সঙ্গে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের কারিগরি উন্মুক্ত আলোচনা সভা

২৫ মার্চ ২০১৯ জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন ভবন; জিইডি- জিওবি - আইএফপিআরআই -এমইউসিএইচ; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে নীতিগত পরামর্শ

১ এপ্রিল ২০১৯ বিআইএসএস কনফারেন্স হল; বিআইএসএস - জিওবি - টিডাব্লিউজি -এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে গঠিত কারিগরি উপ-কমিটিগুলোর প্রথম বৈঠক

১৮-২৩ জুন ২০১৯ এফপিএমইউ কনফারেন্স রুম; এফপিএমইউ - জিওবি - টিডাব্লিউজি -এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে গঠিত কারিগরি উপ-কমিটিগুলোর দ্বিতীয় বৈঠক

২৯ জুলাই ২০১৯ সিরডাপ কনফারেন্স রুমে; এফপিএমইউ - জিওবি - টিডাব্লিউজি -এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে গঠিত কারিগরি উপ-কমিটিগুলোর চূড়ান্ত বৈঠক

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯, হোটেল রোজ ভিউ, সিলেট; এফপিএমইউ_জিওবি_এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা

৩ অক্টোবর ২০১৯, হোটেল টিয়ার গার্ডেন ইন্টারন্যাশনাল, খুলনা; এফপিএমইউ_জিওবি_এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা

১০ অক্টোবর ২০১৯, হোটেল গ্র্যান্ড পার্ক, বরিশাল ; এফপিএমইউ_জিওবি_এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা

১৪ অক্টোবর ২০১৯, দি পেনিনসুলা চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম; এফপিএমইউ_জিওবি_এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা

২১ অক্টোবর ২০১৯, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী; এফপিএমইউ_জিওবি_এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা

২৪ অক্টোবর ২০১৯, সেমিনার কক্ষ, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; এফপিএমইউ_জিওবি_এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা

২৮ অক্টোবর ২০১৯, সেমিনার কক্ষ, আরডিআরএস, রংপুর; এফপিএমইউ_জিওবি_এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা

৭ নভেম্বর ২০১৯, উইন্ডি টাউন, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা; এফপিএমইউ_জিওবি_এমইউসিএইচ; জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা।